কথা

শ্রীযতীন সাহা

রূপ

শ্রীসমর দে

এম্‌. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক--- শ্রীসমর দে ও শ্রীযতীন সাহা
১৫ যুগীপাড়া মেইন রোড, কলিকাতা

সন১৩৪০ সাল

দাম আট আনা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
প্রিণ্টার—প্রভাতচন্দ্র রায়
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

পরিচয়

চীৎকার ক'রে ভূতের ওঝারা মন্ত্র হাঁকছে

গরমের ছুটি এলেই কারও মুখে শুনি দার্জ্জিলিং যাচ্ছি ভাই, —কেউ বলে সিমলা, আবার কেউ বলে শিলং। আমার কিন্তু বাড়ীই যেতে হ'ল নূতন-কেনা বন্দুকটা পৌঁছে দিতে।

ট্রেন থেকে নেমে একটা গরুর গাড়ী ডাকলুম। তখন সবে ভোর হয়েছে। একে পাহাড়ী পথ, তার ওপর আবার কম ক'রে সাতটি ঘণ্টা গরুর গাড়ীতে কাটাতে

হবে ;—সারারাত ট্রেনে ঘুম হয়নি মোটেই—গরুর গাড়ীতেও যে ঘুমোনো যাবে সে আশাও মিছে। কি ক'রে যে এই সাতটি ঘণ্টা কাট্‌বে সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে উঠ্‌লুম।

সঙ্গে জিনিষের ভেতর শুধু বন্দুকের একটা বাক্স। মন্থর গতিতে গাড়ী চল্‌ল পাহাড়ের চড়াই বেয়ে, লাল মাটির রাস্তা ধ'রে। তু'দিকে সারি সারি ঘন শালবন। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু শালবন আর শালবন।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে অস্থির হয়ে উঠ্‌লুম—সময় যেন আর কাটতে চায় না! সর্ব্বনাশ, এত সময় কাট্‌বে কি ক'রে!

গাড়োয়ানকে বল্‌লুম, "গাড়োয়ান ভাই, একটা গল্প বল না শুনি?"

গরুর লেজ তুটো আচ্ছা জোরে মুচ্‌ড়ে দিয়ে গাড়োয়ান বল্‌লে—"চাষাভুষো মানুষ—আমরা কি গল্প কইব বাবু! আপনারা কোলকাতা থাকেন, কত নূতন খবর জানেন; তাই একটা বলুন শুনি।"

কোল্‌কাতার গল্প আর কি বল্‌ব! গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলুম, "দেশের হালচাল কেমন গাড়োয়ান ভাই?"

উত্তরে গাড়োয়ান বল্‌লে, "বড় ভাল নয় বাবু!"

বল্‌লুম,—"কেন ?"

—"আমাদেব গাঁয়ে বড় ভূতের উপদ্রব হয়েছে বাবু !"

—"ভূতের উপদ্রব ! সে কি রকম হে ?"

গাড়োয়ান বল্‌লে,—"গাঁয়ে মোড়লের বাড়ীতে ক'দিন থেকে ভূত অনবরত ঢিল ছুঁড়্‌ছে !"

গরু ছুটোকে একটু জোরে চল্‌বার ইঙ্গিত ক'রে গাড়োয়ান বল্‌লে,—"সত্যি বলছি বাবু—আমি নিজে চোখে দেখেছি। একটু রাত হ'লেই কোথা থেকে সব ঢিল এসে পড়্‌তে স্থুরু করে দেয়।"

কথাটা বিশ্বাস হ'ল না, বরং হাসিই পেল। হেসে বল্‌লুম,—"ভূতে আবার ঢিল ছোঁড়ে, এ কি হতে পারে কখনও !"

গাড়োয়ান বল্‌লে,—"পড়েন-নি তো কোনদিন ভূতের হাতে, তার আর বুঝ্‌বেন কি !"

খুব একচোট হেসে বল্‌লুম, "কেন হে, তুমি পড়েছিলে বুঝি ভূতের হাতে ?"

চোখ ছুটো বড় বড় করে কপালে তুলে গাড়োয়ান বল্‌লে,—"হ্যাঁ—যেতেন একবার আমাদের গাঁয়ে তো বুঝ্‌তেন ভূতের দাপটটা কি !" গ্রামশুদ্ধ লোক ভয়ে সন্ধ্যের পর বাড়ী ছেড়ে

এক পাও নড়ে না। গাঁয়ে ভূতের পূজো হ'লে মোড়ল তাতে চাঁদা দেয় না। আবার বলে কিনা, ভূতটুত আমি মানি না। এবার বুঝছে মজাটা। আজ ঢিল ছুঁড়ছে—কাল হয়ত এসে ঘাড় মট্‌কাবে।"

আমি বল্‌লুম,—"ভূতই যে ঢিল ছোঁড়ে, তা' তোমরা বুঝ্‌লে কি ক'রে! দুষ্ট লোকেরাও তো মোড়লকে ভয় দেখাবার······"

একটু গরম হয়ে গাড়োয়ান বল্‌লে,—"আমাদের কথা বিশ্বাস নাই বা করলেন, কিন্তু ভূতের ওঝাদের মুখে শুন্‌লে বিশ্বাস করবেন তো? কত বড় বড় ওঝারা হয়রান হয়ে গেল! কত জিন্‌পরীর মন্ত্র, কত প্রেতসিদ্ধির পূজো—ভূতে বলে কি-না, কিছুতেই মোড়লকে ছাড়বো না।"

ব্যাপারটা দেখ্‌বার জন্যে বড়ই কৌতূহল হ'ল। তারই সঙ্গে যে একটা অজানা আতঙ্কের ইসারায় বুকটা দুর্ দুর্ করে কেঁপে না উঠ্‌ল, তাও নয়।

তবুও গাড়োয়ানকে বল্‌লুম গাড়ী তাদের গাঁয়ের পথে নিয়ে যেতে।

পশ্চিমের আকাশ রক্তিম করে দিয়ে সূর্য্যদেব তখন শালবনের আড়ালে হারিয়ে গেছে, ঠিক এমনি সময় পাহাড়

ভুতুড়ে ঢিল

ছেড়ে গেঁয়ো পথ ধ'রে গাড়ী এসে একটা বাড়ীব সাম্‌নে দাঁড়াল। এইটেই তবে গাঁয়ের মোড়লের বাড়ী। দিনের আলোতে যেখানে নির্ভয়ে সকলে চলা-ফেরা কর্‌ছে রাতের আঁধারে সেইখানে না জানি কি বিভীষিকাই জাগিয়ে তোলে।

বন্দুকের বাক্সটা হাতে ক'রে আমি গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। মোড়লকে ডেকে, আমার এখানে আস্‌বার কারণটা বুঝিয়ে ব'লে, গাড়োয়ান ভাড়া নিয়ে চ'লে গেল।

কি ক'রে কখন কোথা থেকে ঢিল আসে, উঠোনে পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে মোড়লের সাথে সেই আলাপ কর্‌ছি, ঠিক এম্‌নি সময় পিছন থেকে কে যেন আমার চোখ দু'টো চেপে ধর্‌ল! চম্‌কে উঠে হাত দু'টো ঠেলে দিয়ে ফিরে চাইতেই দেখি—আমারই সমবয়সী একজন লোক। মুখ টিপে সে হাস্‌ছে, পরনে তার খাকি হাফ্‌ প্যান্ট, শার্ট, পায়ে মোজা বুট জুতো।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হ'ল লোকটি যেন আমার খুবই চেনা, কিন্তু কিছুতেই ঠাহর কর্‌তে পারলুম না কোথায় তাকে দেখেছি—কোন ফুট্‌বল্‌ ম্যাচে, না ইষ্টিশানের ওয়েটিং রুমে।

আঁধার রাতের

মুসাফির

লোকটি আমার মুখ চোখের ভাবে ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পেরে হেসে আমার নাম ধরে বল্‌লে,—"পুরোনো বন্ধুদের কি এমনি ভুলে যেতে হয়, বিমল !"

—"ও হরি, অতুল ! আমি কিন্তু ভাই এতক্ষণ অনেক ক'রেও তোমায় চিনতে পার্‌ছিলুম না। ওঃ ! অনেক দিন পরে তোমার সাথে দেখা হ'ল—বোধ করি সাত-আট বছরেরও বেশী হবে, নয় ? তুমি এখানে, ব্যাপার কি ?"

অতুল একটু হেসে বল্‌লে,—"পোষাক দেখে বুঝ্‌তে

পারছো না ? ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের চাকরি—বাঘ ভাল্লুকের মত শুধু এ-বনে সে-বনে ঘুরে বেড়াতে হয়। আমাদের কি ভাই মরবার ফুরসৎ আছে ? এ অঞ্চলে এসেই কুলীদের মুখে শুনলুম গাঁয়ের মোড়লের বাড়ী নাকি বেজায় ভূতের উপদ্রব হয়েছে। তাঁবু ফেলেছি কাছেই। ভাবলুম দেখে আসা যাক্ ব্যাপারটা কি।"

অতুলের হাতটা ধ'রে গোটা কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম,—"কাম্ অন্ মাই ফ্রেণ্ড—দুজনেই দেখছি এক পথের পথিক !"

অতুল আমায় তার তাঁবুতে নিয়ে গেল। বন-মোরগের ঝোল আর ভুনী খিচুরী। এ জীবনে আর সে কথা ভুলব না। বাস্তবিকই অতুল রাঁধতে জানে ! খেয়ে দেয়ে দু'জনে আবার রওনা হলুম মোড়লের বাড়ী। অতুলের হাতে সরকারী মিলিটারী রাইফেল, আর একটা টর্চ-লাইট্। আমিও বাক্স খুলে বন্দুকটা বের করে নিলুম।

ছোট্ট একটা মাঠ পাড়ি দিয়ে গাঁয়ের সীমানায় পা দিতেই ডাক-নামাজের মত একই সাথে তিন-চারজন মানুষের গলার রব শোনা গেল। কিন্তু সে আওয়াজ অস্পষ্ট—কিছুই বোঝবার জো নেই। অতুল বললে, "কিছু বুঝতে

পার্ছো ?" বুঝ্তে পারলুম না, কিন্তু ভয় হল বেজায়। বল্লুম্—

"না। তুমি ?"

—"আমিও না।"

দুজনেই ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে সঙ্গের কুলীর মুখের দিকে চাইলুম। কুলী বল্লে,—"ভূতের ওঝারা জিন-পরীর মন্ত্র হেঁকে বাড়ীর চারদিক বাঁধা দিচ্ছে বাবু, যাতে আর ভূতেরা বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁস্তে না পারে। ভয় নেই, চলুন।"

'ভয় নেই!' একথা শুধু সেই কুলীর মুখেই শোভা পায়! চেয়ে দেখ্লুম অতুলও যেন কেমন নিরুৎসাহ হয়ে গেছে।

আর একটু যেতেই যা কানে এল তাতে আমার আর সাহস হল না যে এক পা এগোই। ক্রমে সেই শব্দ স্পষ্ট হয়ে আমাদের কানের কাছে বেজে উঠ্ল। ওঃ কি ভীষণ সাহস ঐ ওঝা বেটাদের! আর কি বিকট তাদের গলার স্বর! অনর্গল তারা মন্ত্র হেঁকে যাচ্ছে—"জীন পরী বাঁধো বাঁধো—ও কি দয়াময়! কোদালীতে ঘাড় কাটো—ও কি দয়াময়..."

তারই সাথে অদ্ভুত বাদ্য বাজ্ছে-ঝুম্-ঝুম্ ঝুম্-ঝুম্—ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্......

রাত তখন খুব বেশী হয়নি, এরই ভেতর সমস্ত পাড়া

একেবারে নীরব—নিস্তব্ধ! ভূতের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে গাঁয়ের লোক এর মধ্যে চুপচাপ।

কুলী বেচারীকে সাম্‌নে ক'রে মোড়লের বাড়ীর উঠোনে পা দিলুম। সমস্তটা বাড়ী খাঁ খাঁ কর্‌ছে—কোথাও কেউ নেই। শুধু একটা ঘরের দাওয়ায় একটা মশাল জ্বেলে ওঝারা চীৎকার ক'রে মন্ত্র হাঁক্‌ছে! কিন্তু এমনি ভীষণ তাদের চেহারা যে আমি আর তাদের পানে চাইতে সাহস কর্‌লুম না।

আর একটু এগুতেই ধুপ্‌ ধাপ্‌ ক'রে কয়েকটা ঢিল এসে পড়ল আমাদের ডাইনে বাঁয়ে। তবু রক্ষা যে কারুর মাথায় লাগেনি। ভয়ে আমি গিয়ে ঘরের দাওয়ায় উঠ্‌লুম। কুলী বেচারীও চীৎকার ক'রে ছুটে এল আমার পিছু পিছু। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অতুল সেইখানে দাঁড়িয়েই আকাশের দিকে টর্চ্চ জ্বেলে হাঁ ক'রে চেয়ে কি যেন দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এককোণে মোড়ল বসে ছিল বোধ করি, অতুলের ভাব দেখে চেঁচিয়ে বল্‌লে, "ঘরে চলে আসুন বাবু—ঘরে চলে আসুন! ওখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন না!"

ঠিক সেই সময় আবার চারদিক থেকে অনবরত ঢিল এসে পড়তে লাগ্‌ল। অতুল এবারে বোধ করি একটু ভয়

পেয়ে ছুটে এসে ঘরের দাওয়ায় ঢুক্‌ল। এতক্ষণে ওঝারা আমাদেব হাতে বন্দুক দেখে বিস্মিত হয়ে বল্‌লে,—"বন্দুক নিয়ে আপনারা ভূত তাড়াতে এসেছেন মশাইরা! কিন্তু হুঁশিয়ার! দেখ্‌বেন শেষে ভূত খেপিয়ে দিয়ে এতগুলো লোকের জীবন নাশ না হয়!"

ওঝাদের কথা শুনে সকলের বুকের ভেতরটা যেন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সকলেই ভয়ে একেবারে কাঠ।

সবাই চুপ্‌, কারও মুখে টু শব্দটি নেই। একটু পরে অতুল বল্‌লে,—"যত ভৌতিক ব্যাপারই মনে হোক্ না কেন, এর একটা সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে বিমল! নইলে মিছিমিছি হাওয়ার ভেতর থেকে তো আর ঢিলগুলো এসে পড়ছে না?—কিন্তু সেইটেই আমাদের খুঁজে বার কর্‌তে হবে। বাড়ীটার চারদিক এখনও আমাদের ভাল ক'রে দেখা হয়নি। চল বিমল, চারধারের জঙ্গলটা একবার ভাল ক'রে খুঁজে দেখে আসি।"

বাড়ীর চারদিকে দারুণ জঙ্গল। এক দিকে বাঁশঝাড়, অন্য দিকটা নানারকম আগাছায় একেবারে ছাওয়া। অন্ধকারে টর্চ্চের আলোতে মনে হয় ঘন বেতবন। তারই ভেতর থেকে অনেকগুলো বড় বড় শাল গাছ মাথা ঠেলে

উঠেছে। কিন্তু বুনো বেতের হাত থেকে তারা রেহাই পায়নি। আগা পর্য্যন্ত বেতগাছে তাদের ছেয়ে ফেলেছে। হঠাৎ দেখ্‌লে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। ঘুরে ঘুরে টর্চ্চের আলোতে বাড়ীর চারদিকটা দেখে ফির্‌ছি—একটা ঝোপের কাছে এসে হঠাৎ একবার অতুল থম্‌কে দাঁড়ালো। আচম্‌কা বুকটা আমার ধড়াস্‌ ক'রে উঠ্‌ল, বল্‌লুম,—"কি অতুল ?"

কিন্তু উত্তরের পরিবর্ত্তে অতুল সেইদিকে রাইফেল তুলে ধরল। সর্ব্বনাশ! দুশ্চিন্তায় অতুলেব মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে দেখ্‌ছি! এই অন্ধকারে গাঁয়ের লোক খুন কববে নাকি ?

খপ্‌ ক'রে আমি বন্দুকটা ধ'রে ফেল্‌লুম,—"তুমি কি খেপেছ অতুল ?"

—"আঃ কি করছ বিমল ? বন্দুক ছাড় শীগ্‌গির।" ব'লে অতুল বন্দুকটা আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলে।

দু'জনের ধস্তা-ধস্তিতে হঠাৎ কি ক'রে বন্দুকটা ভীষণভাবে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল ; ওঝারা মন্ত্রতন্ত্র ছেড়ে হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে গিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। হায়, হায়! ভূতেরা এবার খেপে গিয়ে না জানি কি অনর্থই ঘটায়!

গাছের উপর টর্চ্চ ফেলে অতুল কি দেখ্‌ছিল, হঠাৎ

আমার হাত ধ'রে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হো-হো ক'রে হেসে বল্‌লে—"ভৌতিক ব্যাপারের রহস্যটা বুঝি আবিষ্কৃত হয়ে গেল বিমল! কিন্তু কি আশ্চর্য্য বল দেখি, কেউ কি স্বপ্নেও এ ভাব্‌তে পেরেছে কখনও!"

অতুলের কথা শুনে তার যে মাথা একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে সে বিষয়ে আমার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইল না।

ভয়ে পা দু'টো আমার থর্‌থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছিল তখনও। অনেক কষ্টে একটা ঢোক গিলে বল্‌লুম—"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে অতুল! ভূতের হাতে প্রাণ যদি দিতে না চাও তবে শীগ্‌গির এখান থেকে পালিয়ে এস।"

চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে অতুল আবার রাইফেল বাগিয়ে ধর্‌লো আকাশের দিকে। একই মুহূর্ত্তে দু'দু' বার তার বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল।

আর রক্ষে নেই, সর্ব্বনাশ! লোকটার মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে! এখন উপায়? আর একটু পরে হয়ত নিজেকেই গুলি ক'রে বস্‌বে। বেগতিক দেখে ফস্ ক'রে আমি অতুলের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পর মুহূর্ত্তেই যা শুনলুম, তাতে—অতুলকে পাগল ঠাওরাবার এবং তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেবার লজ্জায় আমার মাথা হেঁট্ হয়ে গেল।

বার বার বন্দুকের আওয়াজ শুনে বিপদের আশঙ্কায় তখন মোড়ল মশাল হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, পেছনে তার কুলী আর ওঝারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে।

অতুল বল্‌লে,—"ভয় নেই! এগিয়ে এস মোড়ল, এবার থেকে ভূতে আর কখনও ঢিল ছুঁড়্‌বে না তোমাব বাড়ীতে।"

কথাটা বুঝ্‌তে না পেরে মোড়ল কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে চাইল। ঝোপের ভেতর মস্তবড় একটা শাল গাছ দেখিয়ে দিয়ে অতুল বল্‌লে,—"এই গাছটার গোড়া কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেল।"

কিন্তু কুড়ুল আর আন্‌বার প্রয়োজন হ'ল না, গাছের

ভেতর থেকে ভূতেরা কাঁদ-কাঁদ সুরে বল্‌লে,—"যা খুশী তাই করুন আমাদের সাহেব-বাবু ; কিন্তু মেরে ফেলবার হুকুম দেবেন না। দোহাই আপনার!"

সমস্ত রাস্তা কেবলই আমার মনে একই প্রশ্ন জাগ্‌ল,—"কি ক'রে অতুল এদের বার কর্‌লে ?"

তাঁবুতে ফিরে আমার প্রশ্নের উত্তরে অতুল বল্‌লে,—"তুমি এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষ আছ দেখ্‌ছি বিমল! এত সহজ ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পার্‌লে না ?"

অন্ধকারে হঠাৎ বনবেড়ালের চোখের মত জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখে, ভূতের জ্বলন্ত চোখ ভেবে আমি চম্‌কে উঠে রাইফেল তুলে তাগ্‌ ক'রে ছিলুম! কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ভয়ে তুমি আমার বন্দুকের ব্যারেল ধরে ফেল্‌লে। তখন দু'জনের ধস্তাধস্তিতে যে হঠাৎ ফায়ার হয়ে গিয়েছিল, সেটা গাছের ওপর কোথাও গিয়ে লাগে। কারণ, ঠিক ফায়ার হবার সাথে সাথেই আমার মনে হ'ল শূন্য থেকে কা'রা যেন অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। ভাবলুম, হয়ত কেউ ফন্দি এঁটে গাছের ওপর লুকিয়ে থেকে ঢিল ছুঁড়্‌ছিল, বন্দুকের

গুলিতে আহত হয়েছে। তখনি আমি গাছের ওপর অতি সন্তর্পণে টর্চ্চ ফেলে খুঁজে দেখ্‌লুম। কিন্তু মানুষের চিহ্নও সেখানে দেখ্‌তে পেলুম না। হঠাৎ আমার একটা সন্দেহ হ'ল; কিন্তু পাছে তুমি আমায় পাগল ব'লে হেসে উড়িয়ে দাও, তাই তোমায় কিছু বল্‌লুম না। পরপর আরও দু'বার বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করলুম।

সেবার রিজার্ভ ফরেষ্টের নূতন কাঠ কাটার সময় ইন্‌স্‌পেক্‌শানে গিয়ে সেই খোড়ংওয়ালা গাছটা না দেখ্‌লে আমার কিছুতেই এ সন্দেহ হ'তে পারত না যে, গাছের খোড়ং-এর ভেতর আবার লোক লুকিয়ে থেকে ভূতুড়ে ঢিল ছুঁড়্‌তে পারে! একযোগে পাঁচ-সাত জন লোক অবাধে বসবাস কর্‌তে পারে, এরকম খোড়ংও নাকি অনেক সময় পুরোনো শাল গাছের ভেতর পাওয়া যায়! কিন্তু সে যাক্। আমি ভাব্‌ছি এ লোকগুলোর হঠাৎ মোড়লের ওপর এত আক্রোশ হ'ল কি জন্যে!"

অতুলের কথা শুনে গাড়োয়ানের কথাটা মনে পড়ে গেল। বল্‌লুম,—"আক্রোশ হবার কারণ আছে বই কি অতুল? কাল গাড়োয়ান বেটার মুখে শুনেছি গাঁয়ে ভূতের পূজো হ'লে মোড়ল নাকি তা'তে এক পয়সাও

চাঁদা দেয় না, উল্টে আরও বলে, "ও সব ভূতটুত আমি মানি না!"

হো-হো ক'রে হেসে অতুল বল্‌লে,—"যা-হোক্ এদের বুদ্ধির তারিফ কর্‌তে হবে, কি বল?"

অসম্ভব
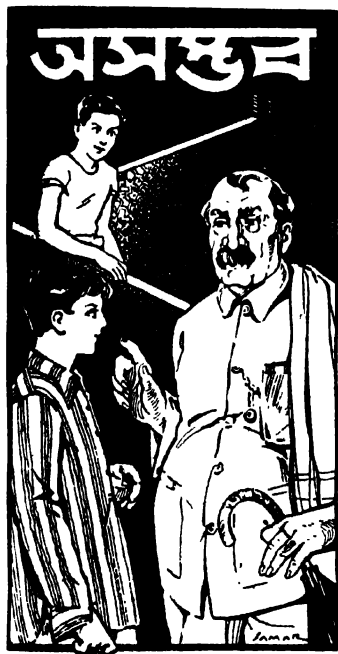
ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে অমল এলো কোল্‌কাতায়—কলেজে পড়্‌তে।

শ্যামবাজারে অমলের মেসোমশায়ের বাসা। ইষ্টিশানে কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে অমল গেল দ'মে। নূতন ও কোল্‌কাতা আস্‌ছে, তাই প্রথমটা কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে অমল নিজেকে যেন একেবারে অসহায় মনে কর্‌তে লাগ্‌ল।

অমল পাড়াগেঁয়ে ছেলে। কিন্তু তবুও সে দম্‌ল না।

অগত্যা একটা রিক্‌সা ডেকে বাড়ীর নম্বর আর রাস্তার নাম করে বল্‌লে, 'চালাও'।

রিক্‌সা এসে বাড়ীর দোর গোড়ায় দাঁড়ালো। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অমল বার বার কড়া নাড়্‌তে লাগ্‌ল।

ভেতর থেকে সাড়া এলো—"কে ?"

অমল বল্‌লে—"আমি।"

—"আমি কে ?"

অমল বল্‌লে—"আমি অমল। দোর খুলুন।"

দোর খুলে গেল। অমল দেখ্‌লে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তার মেসোমশাই। বেতের বাক্সটা নামিয়ে রেখে অমল গড় হয়ে মেসোমশাইকে প্রণাম করলে। মেসোমশাই পূর্ব্বেই অমলের চিঠি দেখেছিলেন। এ উপগ্রহটা যে তাঁর ঘাড়ে চাপ্‌লে কি করে নামাবেন ক'দিন থেকে কেবল সেই চিন্তাই কর্‌ছিলেন। তিনি বল্‌লেন—"এই এলে বুঝি ? নরেনকে ইষ্টিশানে পাঠিয়েছিলুম, দেখা হয়নি ?"

ঠিক সেই সময় অমলের মাস্‌তুতোভাই নরেন ওপর থেকে নীচে নেমে এলো। কথাটা শুনে সে বল্‌লে—"কই, আমায় যে আপনি ইষ্টিশানে যেতে মানা কর্‌লেন বাবা!"

নরেনের কথা শুনে অমলের সব আশাই যেন কর্পূরের

মত উবে গেল। ও কত আশা করেই না এসেছিল -মেসোমশায়ের বাসায় থেকে কলেজে আই-এ পড়্বে। বাড়ীতে এক বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। ওদের অবস্থা এমন কিছু নয় যে, তা থেকে মাস মাস টাকা এনে অমল বোর্ডিংএ থেকে কলেজে পড়্তে পারে। মা অনেক করে অমলের মাসীমাকে চিঠি দিয়ে রাজি করিয়েছেন যে অমল তাঁর ওখানে থেকেই পড়্বে। আর অমল তো অম্‌নি অম্‌নি খাবে থাক্‌বে না, বাড়ীর ফাই-ফর্‌মাসটা করতে পারবে। ত'ছাড়া ছোট খোকা আর খুকীকেও তো সে হু'বেলা পড়াতে পার্‌বে। মাসীমা তাই বোধকরি অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরে রাজি হয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বাড়ীর অবস্থা দেখে অমলের দম আট্‌কে এলো। এই বাড়ীতে তা'কে থাক্‌তে হবে! দিনের পর দিন এম্‌নি করে এদের মন জুগিয়ে চল্‌তে হবে। ছোটবেলা থেকে ও মা'র কাছে আদর-যত্নে মানুষ, কোনদিন ওকে কারও কথা শুন্‌তে হয়নি। আজ ও কি তা' পার্‌বে?

মেসোমশাই বল্‌লেন,—"তা' ক'দিন এখানে থাকা হবে?" নম্রভাবে অমল বল্‌লে—"মাসীমা মাকে চিঠি দিয়েছেন……"

—"চিঠি দিয়েছেন আর অম্‌নি হ'ল? তা' বেশ, তোমার মাসীমা চিঠি দিয়েছেন, তাঁর কাছে যাও। তিনি ওপরে

আছেন। দেখাশোনা কর। স্নান করে খেয়ে দেয়ে, কোথায় থাক্‌বে, কোন্ কলেজে পড়্‌বে তা'র চেষ্টা দেখ। আমার তো আর সময় নেই যে তোমায় নিয়ে কলেজে যাবো ভর্ত্তি কর্‌তে! আফিস্ যাচ্ছি আর ফির্‌বো সেই সন্ধ্যেবেলা।"

মেসোমশাই বের হয়ে গেলেন। অমল সেইখানেই হত-ভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলো। নরেন বল্‌লে—"চলো অমলদা, ওপরে চলো।" এক মুহূর্ত্তে অমলের মাথার ওপর যেন আকাশটা ভেঙে পড়্‌ল। এ বাড়ীতে আর সে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াতে পারছিল না। নরেন এদিকে ডাকাডাকি সুরু করে দিলে—"মা, মা, অমলদা এসেছেন!"

ডাকাডাকি শুনে ওপর থেকে খোকা-খুকী ছুটে এলো, মাসীমাও এলেন। —"ওপরে চলো অমল, জামা জুতো ছাড়্‌বে। দিদি কেমন আছেন?"

অমলের মুখে কথাটি নেই। চুপ্ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অমল মাসীমাকে প্রণাম কর্‌লে। ব্যাগ্‌টা হাতে নিয়ে বল্‌লে—"মা ভালই আছেন। কিন্তু এখন তবে আসি মাসিমা।" মাসীমার কথা কইবার আগেই অমল রাস্তায় নেমে পড়্‌ল, হন্ হন্ করে চোখের পলকে গলির মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। চল্‌তে চল্‌তে অমল এসে বড় রাস্তায়

পড়্‌ল। কোথায় ও যাবে? কোল্‌কাতা সহরে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে ওর কি একটুও দাঁড়াবার জায়গা নেই? মুহূর্ত্তে অমল মন স্থির করলে। যেমন করেই হোক্‌, ওকে একটু থাক্‌বার ঠাঁই কর্‌তেই হবে।

সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে অমলের পা দু'টো হয়ে এলো অবশ অসাড়। পকেটে যে-ক'টা পয়সা ছিল তাই দিয়ে একটা দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেয়ে অমল এসে বস্‌ল হেদোতে। তখন রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে।

গাছের তলায় নির্জ্জন একটা বেঞ্চিতে অমল সটান হয়ে শুয়ে পড়্‌ল। নানা চিন্তায় ওর মাথাটা ঘুরছে। রাত পোহালে যে ওর কি গতি হবে সে কথাটা ভাব্‌তেই অমল শিউরে উঠ্‌ল। গাড়ী ভাড়ার পয়সাটি পর্য্যন্ত নেই যা দিয়ে ও আবার টিকেট কেটে বাড়ী যেতে পারে। ব'সে ব'সে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে অমলের চোখের পাতা দু'টো তন্দ্রায় জড়িয়ে এলো।

কতকক্ষণ এম্‌নি ভাবে কেটেছে অমল জানে না, হঠাৎ কা'র ডাক শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল।—"কি হে খোকা, বাড়ী যাবে না? এত রাতে এখানে প'ড়ে ঘুমুচ্ছো!"

আঁধার রাতের

মুসাফির

অমল চোখ মেলে চাইলো। চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সাদা জিনের কোট গায়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক। মুহূর্ত্তে অমল কিছু ঠাহর করতে পার্‌লে না। ওর মনে হ'ল জেগে জেগে বুঝি ও স্বপ্ন দেখ্‌ছে। ছু'হাতে চোখ রগ্‌ড়ে অমল উঠে বস্‌ল! না, এ তো স্বপ্ন নয়!

ভদ্রলোক বল্‌লেন,—"কোথায় তোমাদের বাড়ী? সঙ্গে আবার বাক্স দেখ্‌ছি। রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছো বুঝি?"

এই ছুঃসময়ে যে এত মিষ্টি করে কেউ কথা কইতে পারে অমল তা' ভাব্‌তেও পারেনি। ভদ্রলোক লাঠিতে ভর করে অমলের পাশে বস্‌লেন।

রাত তখন অনেক হয়েছে। অন্ধকার দীঘির চার দিক দিয়ে শুধু সারি সারি গ্যাসের আলোগুলো রাতের সাক্ষীর মত জ্বল্‌ছে। আশে-পাশের বেঞ্চগুলোতে আগে একটুও বস্‌বার ঠাঁই ছিল না, এখন সেগুলো সব খালি পড়ে রয়েছে। চারদিক একেবারে নীরব। কেবল পাশের বড় রাস্তায় ছু'-একটা মোটরের ভেঁপুর আওয়াজ আর রিক্‌সার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ রাতের আঁধারকে ভয় দেখাচ্ছে।

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "একা বাড়ী যেতে পার্‌বে, না একটা

গাড়ী ডেকে দেবো ?—কি হে কথা কইছ না যে! একা যেতে ভয় করবে ?—সঙ্গে করে পৌঁছে দিতে হবে ?"

কোল্‌কাতার একটা রাস্তাও অমল চেনে না। কি করেই বা চিন্‌বে! আর কোনদিন তো ও কোল্‌কাতা আসেনি! অমলের মনে পড়্‌ল তার মাসীমার বাসার গলির নাম আর নম্বরটা। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ঘৃণায় ওর মনটা তেতো হয়ে গেল। ও রাস্তায় শুয়ে রাত কাটাতে পার্‌বে তবুও মাসীমার বাসায় যেতে পারবে না কিছুতেই।

ছল্ ছল্ চোখে উদাস দৃষ্টি মেলে অমল বল্‌লে, কোল্‌কা-তায় তার বাড়ী নয়।

—"কোল্‌কাতায় বাড়ী নয়, তবে কোথায়?"

—"কোল্‌কাতা থেকে অনেক দূরে—পাড়াগাঁয়ে।"

একে একে ভদ্রলোক অমলের মুখে সব কথা শুন্‌লেন। আদর করে বল্‌লেন—"ভাব্‌না কি তোমার ? তুমি আমাদের বাড়ীতে থেকে কলেজে পড়্‌বে। দু'বেলা অম্‌নি তুমি খেতে পাবে, তার জন্যে তোমাকে সামান্য কষ্ট কর্‌তে হবে। পার্‌বে তো ?—আমার খোকাটিকে রোজ রোজ একটু একটু পারবে না পড়াতে ?—বড় লক্ষ্মী ছেলে সে।"

অমল যেন হাতে স্বর্গ পেলো। এক নিমিষে ওর বিষণ্ণ

মুখখানা উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। একটা ছোট্ট ছেলেকে ও পড়াতে পার্‌বে না! এ আবার একটা কথা হ'ল!—ঘাড় নেড়ে ও জানালো, পার্‌বে।

ভদ্রলোকের সাথে অমল গিয়ে বড় রাস্তায় পড়্‌ল। কিছুদূর গিয়ে বাঁ-দিকে একটা সরু গলি ধরে তারা এগিয়ে চল্‌ল। দু'জনেই চুপ। কারও মুখে কথা নেই। গলিটা যেন আর শেষ হতে চায় না। অন্ধকারে অনেক দূরে দূরে এক একটা গ্যাসের আলো। সে আলোর জোর নেই মোটেই! চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ, শুধু দুজনের জুতোর খট্ খট্ শব্দ ছাড়া আর কোনই শব্দ নেই।

হন্ হন্ করে বুড়ো ভদ্রলোক আগে আগে চলেছেন। অমল যেন আর কিছুতেই তাঁর সাথে পেরে উঠ্‌ছে না।

সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে পা তু'টো ওর হয়ে গেছে অবশ। কতই বা আর একটা মানুষের জানে সয়! ঘামে অমলের জামা-কাপড় ভিজে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু তবুও তাকে যেতেই হবে।

গলাটা সাফ করে অমল বল্‌লে, "আর কতদূর?" চল্‌তে চলতে ভদ্রলোক বল্‌লেন, "এইত কাছেই—এসো।" বুড়ো মানুষ যে আবার এত বেগে চল্‌তে পারে অমল তা কোনদিন ভাব্‌তেও পারেনি।

গলিটা যেন ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে। এতক্ষণ যা তু'-একটা আলো ছিল এখন আর তাও চোখে পড়ে না। তু'পাশের বাড়ীগুলো বহু দিনের পুরোনো। দেয়ালের চুণ-বালি খসে পড়েছে। সমস্তটা গলি জুড়ে কেমন যেন একটা ভাপ্‌সা গন্ধে দম বন্ধ হ'তে চায়। ঠিক এম্‌নি একটা বাড়ীর সদর দরজায় এসে বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলেন, তার পর দোর ঠেলে ভেতরে গেলেন।

অমল অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আর ভদ্রলোককে দেখতে পেলে না। সদর দরজা খোলা, কিন্তু ভেতরে ভীষণ অন্ধকার। অমল থম্‌কে দাঁড়ালো।

—"ওপরে উঠে এসো অমল!" ভেতর থেকে ভদ্রলোকের

কথা শোনা গেল। এই অন্ধকারে কোন্ দিকে বা রাস্তা আর কোন্ দিকেই বা সিঁড়ি! অমল বল্‌লে—"কোথায় আপনি?"

—"এই যে ওপরে—দোতলায়।"

"কিন্তু আলো না হ'লে যাবো কি করে?"—অমল বললে—"একটা আলো ধরুন, কিচ্ছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে!"

—"আলো? হ্যাঁ তা' আলো ধর্‌ছি। তুমি ততক্ষণ না হয় ঐ সাম্‌নের ঘরটাতে একটু বোসো।"

অমল শুন্‌তে পেলো, কথা বল্‌তে বল্‌তে ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন। ক্রমে তাঁর জুতোর শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে একরকম পথ হাত্‌ড়ে অমল গিয়ে সাম্‌নের ঘরটাতে ঢুক্‌ল।

পাড়াগেঁয়ে ছেলে অমল—ভয় যে কা'কে বলে ও তা জানেও না। কত ভয়ানক জায়গা দিয়ে ও গিয়েছে, ভয় পায়নি একদিনও।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটাতে অমল যেন কেমন শিউরে উঠ্‌ল। এত সকাল-সকালই কি বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে! কিন্তু তাই যদি বা হয় তবে দরজা অমন আল্‌গা রেখেই বা ঘুমুবে কেন? তবে কি কোল্‌কাতা সহরে চোর

ডাকাতের ভয় নেই? আশ্চর্য্য ব্যাপার তো! রাস্তার নিস্তেজ গ্যাসের আলো, এঁদো পচা সরু গলি, ভাঙা পুরোনো বাড়ী, সমস্ত মিলে যেন অমলের মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হ'ল।

অমলের চিন্তায় বাধা পড়্‌ল। ওপরে আবার জুতোর শব্দ শোনা গেল। সাড়া পেয়ে অমল বল্‌লে—"কই মশাই? একটা আলো-টালো ধরুন, আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বো এই আঁধার ঘরে?"

—"না বাবা, এইতো যাচ্ছি। খোকা, খোকা গেল কোথায়? ছোঁড়াটাকে খুঁজে পাচ্ছিনা মাষ্টার মশাই! আর আলোই বা পাই কোথায়? তুমি একটু কষ্ট করে ওপরে উঠে এসো না বাবা; দেখ বাঁ-দিকেই তোমার সিঁড়ি। এ বাড়ীতে তো আর ইলেক্‌ট্রিক্ আলো নেই যে টিপ্‌লেই জ্বলে উঠ্‌বে! দেশ্‌লাইটাও আবার পাচ্ছি না খুঁজে। মহা মুস্কিল!"

অনেক কষ্টে সিঁড়ি হাত্‌ড়ে অমল গিয়ে দোতলায় উঠ্‌ল। কিন্তু সেখানেও ঠিক তেম্‌নি অন্ধকার।

অমল বল্‌লে—"কোথায় আপ্‌নি? এই যে আমি দোতলায় উঠেছি।"

আঁধার রাতের

মুসাফির

—"দোতলায় নয় মাষ্টার মশাই, আর একটু কষ্ট করে তেতলায় উঠে এসো। এখানে যাহোক্ একটু আলো আছে। এসো, এসো শীগ্‌গির; আমার খোকাটাকে খুঁজতে হবে—সে যাবে কোথা।"

তবে কি একটা মাতালের সাথে অমল এতদূর এসেছে! অমলের যেন কেমন ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। মাতাল! মাতালের কোনো লক্ষণইতো সে বুড়োর কাছ থেকে পায়নি! তবে কি? অমন করে ব্যস্ত হয়ে বুড়ো ভদ্রলোক অন্ধকারে ছুটো-ছুটি কর্‌ছে কেন?

বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে অমল বল্‌লে—

—"আপনি এ কি বল্‌ছেন—'খোকা—খোকা যাবে কোথায়'? এ বাড়ীতে কি লোকজন কেউ নেই নাকি?"

সব চুপ্—কোন সাড়া নেই। অন্ধকার, ভয়ানক অন্ধকার! তবুও সাহস করে সেই অন্ধকারের সাগর পাড়ি দিয়ে অমল গিয়ে তেতলায় উঠ্‌ল। সাম্‌নে বারান্দা, ওপরে খোলা ছাদ। কালো আকাশের গায়ে ছোট ছোট তারাগুলো তখনও মিট্ মিট্ করে জ্বল্‌ছে। অমলের সাড়া পেয়ে একটা প্যাঁচা আর কতকগুলো বাদুড় ঘর থেকে বেরিয়ে পাখা ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে উড়ে পালালো। কোথায়

ভদ্রলোক ? অমল এদিক সেদিক চেয়ে কাউকে দেখ্‌তে পেলো না। হঠাৎ একটা চাপা কান্নার স্বর অমলের কানে এলো। মনে হ'ল, ছোট্ট একটি ছেলে যেন কিসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাঁদছে। তারপরই একটা বিকট শব্দ! অমল চেয়ে দেখ্‌লে তার মাথার ওপর ছাদের কর্নিশে বসে একটা শকুনি—প্রাণপণ জোরে চ্যাঁচাচ্ছে!

ব্যস্ত হয়ে অমল বল্‌লে—"কোথায় গেলেন আপ্‌নি ? দেখুন তো ওদিকে কে কাঁদছে! ছোট ছেলের কান্নার মত মনে হচ্ছে যে!—কই কোথায় আপ্‌নি ? আর ও শকুনিটাই বা ওখানে এলো কোত্থেকে!"

—"এই তো আমি তোমার কাছেই দাঁড়িয়ে। দেখ্‌তে পাচ্ছো না ? তা পাবেও না। যাক্, খোকাকে আর পড়াতে হবে না। আর তাকে পড়াবেই বা কি করে! তবে হ্যাঁ, তোমাকে যেমন করেই হোক্ কোল্‌কাতায় থেকে পড়াশুনো কর্‌তে হবে বল্‌ছিলে না ? তোমায় যখন বলেছি তখন তোমার সাহায্য আমি কর্‌বোই করবো।"

—"খোকাকে পড়াতে হবে না! তার মানে ?" অমল যেন সহসা কিছু ঠাহর করতে পার্‌লে না। বাড়ীতে আলো নেই, অথচ খোকাই বোধ করি সুমুখের ঘরটাতে

পড়ে পড়ে কাঁদ্‌ছে। আর ভদ্রলোকই বা কেমন মানুষ, এতক্ষণ ধরে একটা আলো পর্য্যন্ত আন্‌তে পার্‌লেন না। কেন এমন হ'ল! বাদুড় আর পেঁচাইবা এলো কোথেকে আর ঐ শকুনিটাই বা কাঁদ্‌ছে কেন?—আশ্চর্য্য! সবই যেন অমলের কাছে একটা ভেল্কির মতন মনে হ'তে লাগ্‌ল—এ কোথায় সে এলো তবে?

অমল বল্‌লে—"থাক্, আলো যখন পাচ্ছেন না তখন আর আলোর দরকার নেই। কিন্তু কি বল্‌ছিলেন—খোকাকে পড়াতে হবে না?"—অমল বল্‌লে—"শুন্‌ছেন? হ্যাঁ মশাই··· ?"—কোনই সাড়া নেই!

হঠাৎ অমল দেখ্‌লে, সেই অন্ধকারের মধ্যেও সাদা ধব্‌ধবে জামা গায়ে সেই বুড়ো ভদ্রলোক তার সুমুখে দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক বল্‌লেন—"খোকা,—আমার বড় আদরের খোকা ছিল সে। কিন্তু সে যাক্। ঐ ঘরের মেঝের সিমেণ্টের তলায় দু' হাজার টাকা পোঁতা আছে দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে, মেঝের সেখানটা একটু উঁচু। টাকাগুলো তুমি নিয়ে যেও; ওতে আর আমার দরকার হবে না, কিন্তু তোমার কাজে আস্‌বে।"

বিমূঢ়ের মত অমল কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলো। হঠাৎ

সেই বুড়ো লোকটি তার চোখের সুমুখ থেকে অন্ধকারে ডুবে গেল, আর অম্‌নি অমলের কানে এল, সমস্ত বাড়ীশুদ্ধ লোক যেন কি এক ভীষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে কাঁদ্‌ছে—আর মাথার ওপর সেই শকুনি! ওঃ, কী তার রক্ত চক্ষু! কী তার কান-ফাটানো বিকট কর্ক্কশ চীৎকার!

মুহূর্ত্তের জন্যে অমল যেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না। ভাল করে চারদিকে কান পেতে যা শুনলে তাতে তার মত সাহসী ছেলেরও বুকটা দুর্‌ দুর্‌ করে কেঁপে উঠ্‌ল।

এই অন্ধকারে সে যাবে কোথায়! চীৎকার কর্‌লেই বা কে শোনে! তবুও অমল সাহস করে সিঁড়ির দিকে চল্‌ল। কিন্তু একটু যেতেই সে থম্‌কে দাঁড়াল। অন্ধকারে চোখের সাম্‌নে তার ওটা কি? অমল চেয়ে দেখ্‌লে মস্ত বড় একটা নরমুণ্ড অন্ধকারের কোলে ভেসে রয়েছে। কোথাও আলো নেই অথচ তার মুখে তীব্র আলো। মরা মানুষ অমল ঢের দেখেছে। কিন্তু একি! এর মুখে ভাব নেই, চোখে ভাষা নেই, চামড়ায় রং নেই। পলকহীন স্থির চক্ষু। মরা মানুষের চোখের চাইতেও ভীষণ! এ কার মুখ তবে? একি জীবিত না মৃত? তিন

লাফে অমল সরে এলো রেলিংএর দিকে। কিন্তু একি!

সেই মুণ্ডুটাও যে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে! কম্পিত পদে অমল পিছিয়ে যেতে লাগ্‌ল কিন্তু তবুও নিস্তার নেই, সেই মুণ্ডু ঠিক তেম্‌নি ভাবে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্‌ল! হায়, হায়! এই বোবা যখটাই তবে বোধ করি এ বাড়ীর সবাইকে এম্‌নি করে শেষ করেছে! হতজ্ঞান হয়ে অমল ছাদের ওপর থেকে গোটা কয়েক ইঁট্‌ নিয়ে ছুড়ে মার্‌ল সেই মুণ্ডু লক্ষ্য করে।

কপালে লেগে মাংস ছিঁড়ে গেল, কিন্তু তাতে এক বিন্দু

রক্তও নেই—সাদা ফ্যাকাসে মাংস—সেটা ঠিক তেম্‌নি ভাবে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল !

ভয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে অমল একেবারে রাস্তায় এসে পড়ল। অন্ধকারে কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেয়ে অমল পড়ে গেল।

শরীরটা তার তখন ভয়নক অবশ হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াতেই সে দেখ্‌লে বড় রাস্তা দিয়ে জন কয়েক লোক সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা শব বয়ে নিয়ে চলেছে শ্মশানে, আর মাঝে মাঝে তারা বল্‌ছে—'বল হরি, হরি বোল্‌,' 'বল হরি, হরি বোল্‌' !

অমলের সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল মেঝের সিমেণ্টের নীচের সেই দু'হাজার টাকার কথা। আর যাই হোক্‌ টাকার খোঁজ তাকে করতেই হবে। কিন্তু একি, চোখের সাম্‌নে আবার সেই মুখ! এতক্ষণ ধরে ওটা তবে তার পেছু পেছু এসেছে। হায় হায়, বাকী রাতটুকু তবে সে কাটায় কোথায়! উপায় না দেখে অমল ছুটে গিয়ে সেই শ্মশান-যাত্রীদের সঙ্গ নিল—তাতেও যদি বাকী রাতটুকু কেটে যায় !

রিকসাওয়ালা
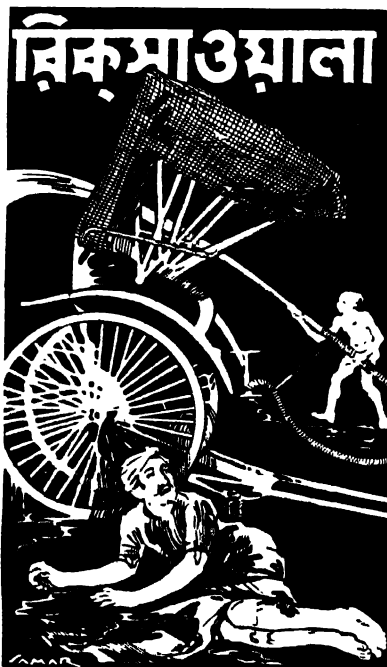
সেই ভোর-বেলা থেকে সুরু করে সমস্ত শহরটা চষে বেড়িয়েও রাম-ধনিয়ার ভাগ্যে একটা কাণাকড়ি ভাড়াও জুটল না— শুধু তা'র ঠুন্‌-ঠুনোনিই সার হ'ল।

'কোল্‌কাতা শহ-রের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কি একটা লোকেরও আজ 'রিক্সা' ডাকার প্রয়োজন হ'ল না ?' —ক্ষোভে দুঃখে রামধনিয়ার মনটা তেতো হ'য়ে উঠ্‌ল অনেক কষ্টে 'রিক্সাটাকে' টেনে নিয়ে গিয়ে হেদোর

ধারে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল। ক্ষিদেয় তা'র প্রাণ যায় আর কি—কিন্তু তা হ'লে হবে কি, ট্যাঁকে যে একটা পয়সাও নেই!—হায় রে 'রিক্সা'ওয়ালা!

সারাদিনের পরিশ্রম আর ব্যর্থতায় রামধনিয়ার শরীর অবশ অসাড় হয়ে এল—চোখের সাম্‌নে দিয়ে তা'র রাশি রাশি সর্ষেফুল নাচ্‌তে নাচ্‌তে একবার আঁধারে ডুব্‌ দিল আবার ভেসে উঠ্‌ল! অনেক কষ্টে একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে রামধনিয়া তার ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিল 'রিক্‌সার' গদিতে।—রাস্তায় রাস্তায় তখন গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে।

এই ভাবে কতক্ষণ নেতিয়ে প'ড়ে ছিল রামধনিয়ার খেয়াল নেই।—হঠাৎ হুঁস্‌ হ'ল তা'র, কার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে। অনেক কষ্টে রামধনিয়া মাথা তুলে দেখে, তা'র কাছে সাদা ধব্‌ধবে একটা পাঞ্জাবী গায়ে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক!—তড়াক্‌ করে উঠে রামধনিয়া বল্‌লে—"ভাড়া হোগা বাবু?"

ভদ্রলোক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন—"আরে বাপু, কানের মাথা কি খেয়ে বসেছ যে, কানের কাছে ঢাক পেটালেও তোমার ঘুম ভাঙে না?"

মুখ কাচুমাচু কর্‌তে কর্‌তে রামধনিয়া বল্‌লে—"কসুর মাফ্ কিজিয়ে বাবু······বহুৎ হায়রান হুয়াথা।"

"আরে রাখ বাবু তোমার হুয়াথা"—বলে ভদ্রলোক সোজা গিয়ে 'রিক্সা' চেপে বস্‌লেন।

শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে রামধনিয়া বল্‌লে—"কিধার যাইয়েঙ্গে বাবু?" সে কথার কোনই জবাব না দিয়ে ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বল্‌লে—"ছাপ্পর লাগাও উল্লুক কাঁহাকা!"

ভদ্রলোকের মেজাজ দেখে রামধনিয়ার মনে হ'ল—ক'সে তা'র গালে এক চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু কি আর করে, এত কষ্টের পর একটা ভাড়া—তাও তা'হলে ফস্‌কে যাবে। রামধনিয়া গাড়ীর 'হুড্' টেনে হাতল ধরে গাড়ী তুল্‌তেই ভেতর থেকে ভদ্রলোক কড়া মেজাজে বলে উঠ্‌লেন—"এই উল্লুক! জল্‌দি হাঁকাও!"

লোকটার ওপর রামধনিয়া হাড়ে হাড়ে চটে গেল; কিন্তু কিছু বল্‌লে না।

শীতের রাত—চারিদিক্ একেবারে নিস্তব্ধ, একটা জন-মানবের সাড়াও নেই! গাছের তলায় তলায় অন্ধকারের জটলা বসে গেছে—করপোরেশনের সারি সারি আলোর

থামগুলোর মাথায়—ভূতের চোখের মতন জ্বলজ্বলে আলোগুলো যেন সেই অন্ধকারকে গ্রাস কর্‌তে চাচ্ছে। রাস্তার দু'ধারের বাড়ীগুলো গাছপালায় ঢেকে ঠিক এক একটা দৈত্য-দানবের মত আব্‌ছা আব্‌ছা আঁধারে যেন ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে; সুযোগ পেলেই পথিকদের ঘাড় মট্‌কাবে। কোল্‌কাতা শহর যে আবার এত স্তব্ধ হ'তে পারে রামধনিয়া সেটা আজ বুঝ্‌ল।

কি শীত রে বাপ্‌! পিচের রাস্তা ত নয়, যেন বরফের পথ। রামধনিয়া চল্‌তে সুরু করে দিলে—তা'র ঘন্টি বেজে উঠল ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্। কিছুদূর যেতেই ভদ্রলোক ক্যান্‌-কেনে গলায় বলে উঠলেন—"এই, মৎ বাজাও—মৎ বাজাও!"

এ আবার কেমন ভদ্রলোক রে বাবা! এও কি জানেনা যে 'রিক্‌সা'ওয়ালার ঘন্টি শুধু মানুষ গরু তাড়াবার জন্যে নয়—গানের তালের মত চলার তালে তালেও সে ঘন্টি বাজে!

আর ঘন্টি বাজান হ'ল না। ভদ্রলোকের সব হম্বি-তম্বিই রামধনিয়ার সইতে হ'ল—সে শুধু একটা কারণে। এমন ভাড়া সে আর কোন দিনই পায়নি—লোকটা

বেজায় হাল্কা! রামধনিয়ার মনে হ'ল যেন শুধু গাড়ীটাই টানছে।

রামধনিয়া 'ফিটন্' গাড়ীর ঘোড়ার মত ছুটে চল্ল। ছুট্তে ছুট্তে একটা মোড়ে এসে গাড়ী থামালে।—এবার কোন্ পথে যাবে?

ভেতর থেকে হুকুম হ'ল—"চালাও সোজা!" আবার লম্বা লম্বা পা ফেলে রামধনিয়া গাড়ী চালালে। এত বেগে সে চল্ল যে, সেই কন্কনে মাঘের শীতেও ঘেমে তা'র কোর্ত্তা ভিজে গেল—তবুও পথ ফুরোয় না।

রামধনিয়ার বুকটা ধড়্ফড়্ করে উঠ্ল। আজকে শহরের এই নির্জ্জনতা, তুনিয়ার এই নিস্তব্ধতা, গাছপালা ঘরবাড়ীর এই উদাস মূর্ত্তি—সমস্তই যেন কেমন আস্বাভাবিক ঠেক্ল রামধনিয়ার কাছে। তবুও তাকে চল্তে হবে—কোথায় কতদূর কে তা জানে।

ঘণ্টাখানেকেরও বেশী সময় কেটে গেছে, তবুও রাম-ধনিয়া প্রাণপণ বেগে ছুটে চলেছে। কিন্তু কোথায়? ছুট্তে ছুট্তে রামধনিয়া জিজ্ঞেস কর্লে—"আউর কেত্তা দূর বাবু?"

'রিক্সার' ভেতর থেকে তেম্নি কর্কশ স্বরে জবাব এল—"চালাও সোজা।"

আঁধার রাতের

মুসাফির

এ আবার কেমন লোক রে বাবা! কেবল চালাও সোজা আর চালাও সোজা!

কি একটা দুঃসহ, অজানা আতঙ্কে রামধনিয়া অস্থির হয়ে উঠ্ল। এ কোথা দিয়ে সে গাড়ী চালিয়েছে—এযে অন্ধকার মাঠ! রামধনিয়া তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গাড়ী টান্‌ছে, তবুও সে মাঠ ফুরোয় না! মাঠ তো নয়—যেন একটা অন্ধকারের মায়া-সরোবর!—তার কূল নেই কিনারা নেই! তবুও রামধনিয়া কিছু বল্‌তে সাহস কর্‌লে না। যেমন বদমেজাজি লোক তা'র গাড়ীতে উঠেছে, কি জানি যদি সটান নেমে ভাড়া না দিয়ে এই আঁধারে পালিয়ে যায়?

কন্‌কনে বাতাস যেন চুপি চুপি এসে রামধনিয়ার কানে কানে বল্‌ছে—'রিক্‌সাওয়ালা! এ মৃত্যুপুরীর ভেতর দিয়ে তুমি চলেছ কোথায়?—প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও এই বেলা।'

মাথাটা একবার নাড়া দিয়ে রামধনিয়া ভাব্‌লে, দূর ছাই, এ সব কি উদ্ভট কথা ভাবছি! তা'র মনে বার বার একই প্রশ্ন উঠ্‌ল—এ সব বাজে স্বপ্ন দেখা কেন?—কেন আরোহী তা'র এম্‌নি খিট্‌খিটে মেজাজের? কেন সে বল্‌ছে না কোথায় যাবে?

হাজার হোক্, মানুষ তো! কতই আর ছুটতে পারে!—রামধনিয়ার কান ভোঁ-ভোঁ করতে লাগ্ল, মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগ্ল। তবে কি দুনিয়াটা আজ তা'র 'রিক্সার' চাকার পাকে পাকে শুধুই ঘুরছে?……

হঠাৎ কোথা থেকে একটা বোট্কা গন্ধ এসে রাম-ধনিয়ার পেটের নাড়ী ভুঁড়ি মুচ্ড়িয়ে দিয়ে গেল—ঠিক্ যেন বাসি মড়ার গন্ধ! এক হাতে নাক টিপে ধরে সে তীর-বেগে ছুটে চল্ল। কিন্তু—না—তবুও সে পচা গন্ধ যায় না! ঠিক এম্নি সময় গাড়ীর ভেতর কে যেন বিকট রবে হেসে উঠ্ল।

রামধনিয়ার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—তবে কি সে এতক্ষণ ধরে একটা মাতালকে তা'র গাড়ীতে তুলে মিছি-মিছি হয়রান হচ্ছে? রাগে দুঃখে রামধনিয়া ধপ্ করে গাড়ীর হাতলটা হাত থেকে ফেলে দিলে। অম্নি আবার সেই অট্টহাসি—হিঃ—হিঃ—হিঃ!

এবারে মুখ ফেরাতেই চোখের সাম্নে যে দৃশ্য দেখ্লে তাতে রামধনিয়ার মাথা ঘুরে গেল।

সাদা পাঞ্জাবী-পরা সে ভদ্রলোক আর নেই; তার জায়গায় 'রিক্সার' গদি জুড়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে রয়েছে

আঁধার রাতের

মুসাফির

একটা নর-কঙ্কাল—চোখে তার আগুনের দৃষ্টি। রামধনিয়ার সাথে চোখোচোখি হতেই দাঁত খিঁচিয়ে কঙ্কালটা ছুটে এল তা'র টুঁটী চেপে ধর্‌তে।
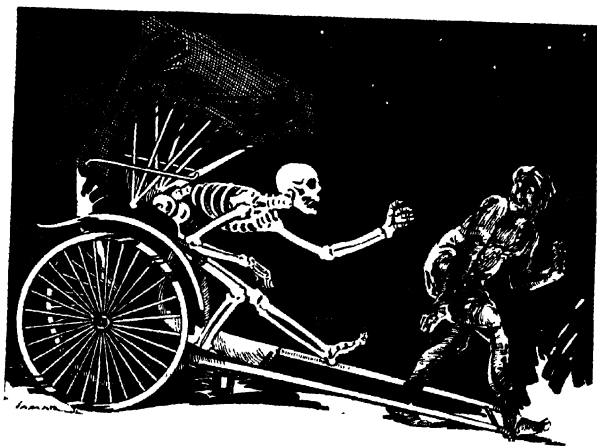
রামধনিয়া প্রাণপণ বেগে মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটল—কঙ্কালটাও বকের মতন লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুট্‌ল তা'র পেছু পেছু।

রামধনিয়া আর পার্‌লে না, দড়াম করে প'ড়ে গেল, অম্‌নি বিকট এক হাসি হেসে কঙ্কালটা এসে একেবারে

তা'র বুকের ওপর চেপে বস্‌ল। ওঃ সে কি ঠাণ্ডা! বরফও তার কাছে হার মানে। আর রক্ষা নেই—কঙ্কাল তা'র লম্বা লম্বা হাত দিয়ে রামধনিয়ার টুঁটী চেপে ধর্‌ল—রামধনিয়া চেঁচাতে গেল কিন্তু তা'র গলা দিয়ে কথা বের হ'ল না।...

হঠাৎ চোখ মেলে চাইতেই রামধনিয়া দেখ্‌লে সে 'ফুট্‌পাথে'র ওপর প'ড়ে রয়েছে, আর একদল রাস্তায়-জল-দেওয়া উড়ে হো হো করে হাস্‌ছে। জলে তা'র জামা, কাপড়, কাঁথা ভিজে একাকার হয়ে গেছে। তবে কি গত রাতের বিভীষিকা সত্যি নয়?—কিন্তু রামধনিয়ার কেবলই মনে হ'ল সে যা দেখেছে সবই সত্যি—এক বিন্দুও মিথ্যে নয়।

ভূতুড়ে কোর্ট

কবে, কি করে যে আমাদের ইস্কুলের একটা ঘরের নাম হয়ে গেছে 'ভূতুড়ে কোঠা', তা' আমরা কেউ তো জানিই না—আমাদের অনেক আগে যাঁরা এ ইস্কুল থেকে পাশ করে গেছেন, তাঁ'দের কাছেও এব একটা সঠিক জবাব পাওয়া যায় না। অনেকে অনেক কথা বলে।

কেউ বলে, যখন ইস্কুলের মাটির ঘর ভেঙে পাকাবাড়ী তৈরী করা হয়, তখন নাকি এক সাঁওতাল কুলীর

সর্দ্দার ঐ ঘরে কড়িকাঠ চাপা প'ড়ে মরে। সেই থেকে লোকে ও ঘরটার নাম দিয়েছে ভূতুড়ে কোঠা।

এমনি অনেকের মুখে অনেক কথাই শোনা যায়। কিন্তু সে যাক্। সেই থেকে ও ঘরটাতে আর ক্লাস বসে না। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরটাতে যত রাজ্যের বাদুড় আর চামচিকে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। উই ধ'রে দেওয়ালের চুনবালি গেছে ধ'সে। আর ও ঘরে যে ভূত থাক্‌বে তার আর আশ্চর্য্য কি! ঘরটার সাম্‌নে দিয়ে গেলে একটা দুর্গন্ধে গা বমি বমি করে।

বোর্ডিংএর 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট'-বাবু নূতন ছেলে বোর্ডিংএ এলেই সাবধান করে দেন—"খবর্দ্দার, ও ভূতুড়ে ঘরের কাছ ঘেঁসোনা কিন্তু! জাননা ত, তাই আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি। ঐ ঘরে এক সাঁওতাল কুলীর অপঘাতে মৃত্যু হয়। তা'র প্রেতাত্মা কিন্তু এখনও ওঘর ছাড়েনি। সুযোগ পেলেই তোমাদের ঘাড় মট্‌কাবে! আমি নিজ চোখে দেখেছি—কালো মিশ্ মিশে্, দেখ্‌তে ঠিক একটা দৈত্যির মত। অন্ধকার রাতে ইস্কুলের চারিদিক দিয়ে ঘুর্ ঘুর্ ক'রে বেড়ায়। একা কাউকে পেলে বলে —আমার সাথে আয়—আমার বিচার করে দে।"

এ ছাড়া বোর্ডিংএর কড়া নিয়ম—সন্ধ্যার পর কেউ আর ইস্কুলমুখো হ'তে পারবে না।

প্রথম বোর্ডিংএ এসেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর এই অযথা নিয়মটা আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ল না, কিন্তু বোর্ডিংএ যখন থাক্‌বই তখন বাধ্য হয়ে তার নিয়মও পালন করতে হবে।

মাঘের শেষে আমাদের ইস্কুলে সরস্বতীপূজোর ধুম প'ড়ে গেল। লেখাপড়ার বেশী তাড়া নেই—ইস্কুলে গিয়ে শুধু চাঁদা আদায় করা আর থিয়েটারের মহলা দেওয়া।

তারপর একদিন ফুলের মালা আর দেবদারুর পাতায় সমস্ত স্কুলটা সেজে উঠ্‌ল। হল ঘবটার একদিকে যতরাজ্যের বেঞ্চ জুড়ে করা হ'ল থিয়েটাবের মঞ্চ।

ঘটা করে পূজো হয়ে গেল। তারপর সুরু হ'ল বড় রকমের এক ভোজ—লুচি-পায়স দই সন্দেশের হরিলুট আর কি।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে থিয়েটার—ছেলেরা সব ভেঙে পড়ল 'হল' ঘরে। মাষ্টার মশাইরাও এলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুও এলেন। তাঁদের আসন করে দেওয়া হয়েছে সকলকার সামনের 'রো'তে।

আঁধার রাতের

মুসাফির

ঠিকসময় থিয়েটার আরম্ভ হ'ল। জোর 'য়্যাক্‌টিং' চল্‌ছে—অঙ্কে অঙ্কে বাহবা আর হাততালির চোটে সমস্ত হল-ঘরটা গম্ গম্ করে উঠছে! আমার ছিল শেষ অঙ্কে পার্ট—বসে বসে হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

রইল প'ড়ে 'সোর্ড' আর জরীর কাজ করা মকমলের পোষাক—কাপড়ের খুঁটে মুখের 'পেইন্ট' মুছে ফেলে একটা বাবড়ী চুল, একটু কালো ক্রেপ্, আর রূপোলী রং-এর একজোড়া বালা র‍্যাপারের নীচে লুকিয়ে নিয়ে টুক্ করে আমি 'গ্রীনরুম' থেকে স'রে পড়্‌লুম। তারপর ছুট্‌তে ছুট্‌তে একেবারে বোর্ডিং-এ নিজের ঘরে।

রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে হিন্দুস্থানী চাকরটা তখনও ময়দা বেল্‌ছিল; তা'র কাছ থেকে খানিকটা তৈরী ময়দা চেয়ে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে, দিলুম দোর ভেজিয়ে।

এবার 'মেক্‌আপ্' সুরু করে দিলুম। প্রথমে কাপড়টা টেনে হাঁটুর ওপর তুলে ঠিক সাঁওতালী ধরন করে পড়্‌লুম। তারপর কালোকালীর দোয়াতটা নিয়ে সমস্ত শরীরে মাখলুম কালী। পুডিং-এর মত তৈরী ময়দা খানিকটা করে নিয়ে হাতে, পায়ে, মুখে, বুকে লাগিয়ে তার ওপর ঢেলে দিলুম লালকালী—ব্যস্! আর চাই কি—এবার

বাবড়ী চুলটা মাথায় এঁটে দিয়ে, ক্রেপ্‌টা বেশ করে ছেটে নিয়ে সাওতালীদের মত গোঁফ লাগিয়ে বালা ছু'গাছা হাতে পরলুম। দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার কাছে গিয়ে আমি যেন নিজকেই চিনতে পারলুম না।—আমিই কি সতু রায়? না এ যেন ঠিক এক সাওতাল সর্দ্দার!

বাঃ বাঃ, এইত চাই, নইলে আবার 'মেক্‌আপ' কি। কোথায় লাগে লনচ্যানী! আমিই বা এখন লন্‌চ্যানীর চাইতে কম কিসে!"

তাড়াতাড়ি র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে, চোরের মত চুপি চুপি ইস্কুলের পেছন দিকটার দরজা দিয়ে একেবারে সেই ভূতুড়ে ঘরটাতে গিয়ে ঢুক্‌লুম।

থিয়েটার তখন খুব জমে উঠেছে—রাতও নেহাৎ কম হয়নি। উঁকি মেরে দেখলুম 'ষ্টেইজের' আলো একটু কমে আসছে।—এইত সুযোগ! র‍্যাপারটা ফেলে দিয়ে হন্ হন্ করে সোজা 'ষ্টেইজের' কোণের দরজার কাছে গিয়ে নাকা সুরে বল্‌লুম—

"সুপারিন্টেন্ বাঁবু, তুঁ আভি ইঁা মার বিঁচার কঁরেক— নঁইলে আঁজ আঁর তুঁর রঁক্ষা নেই..."

যেই-না বলা, 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট' বাবু আমার দিকে

ফিরে চাইতে না চাইতেই চোখ দু'টো তাঁর ভাঁটার মত গোল হয়ে কপালে উঠল। ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তিনি একটা অদ্ভুত রকম শব্দ করে চেয়ার থেকে প'ড়ে গেলেন। মাষ্টার মশাইদের অবস্থাও তাই।

ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লুম—"হাঁমার চেঁনেক্ নাঁক্—দেঁখ্ হাঁমার কি হঁইয়েছে—হাঁমি বিঁচার চাই!"

এক মুহূর্ত্তে চেয়ার বেঞ্চ ছেড়ে চীৎকার করতে করতে যে যার মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ল হল-ঘর শূন্য করে। ষ্টেইজের

বাইরে দু' দিকে ছিল দু'টো 'গ্যাসষ্ট্যাণ্ড'—ধাক্কা খেয়ে সে দু'টো ছিট্‌কে প'ড়ে গেল নিবে।

ড্রিল-মাষ্টার মশাই ছিলেন ভয়ানক দুঃসাহসী, তিনি ধেয়ে এলেন আমার দিকে। ধরা পড়লুম ভেবে বিকট একটা চীৎকার করে কাৎরাতে কাৎরাতে আমিও ধেয়ে গেলুম তাঁর দিকে।

কোথায় গেল তাঁর সাহস! উল্টে তিনিই ডাক ছেড়ে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠ্‌লেন ষ্টেইজের ওপর। আর যেই না ওঠা, ওদিকে ষ্টেইজের লোকও ভয়ে ছেড়ে দিলে 'ড্রপ'। পড়্‌বি তো পড়্‌ একেবারে ড্রিল-মাষ্টার মশাইয়ের মাথার ওপর!

রইল প'ড়ে থিয়েটার—আঁধার ঘরে সে কি হুটোপাটি রে বাবা!

এদের সাহস দেখে আর হাসি চাপতে পার্‌লুম না—একটানে বাবড়ী চুলটা ফেলে দিয়ে মুখ চেপে হাসতে হাসতে আমি সটান্ দৌড় দিলুম বোডিং মুখো। পরদিন ইস্কুলে যেতেই দপ্তরী এসে বল্‌লে—"সতুবাবু, আপ্‌কো হেড্-মাষ্টার বাবু বোলায়া।"

হেড্‌মাষ্টার বাবু বোলায়া!—প্রাণটা আমার ছাঁৎ করে উঠ্‌ল।

বল্লুম—"কেন রে, কি হয়েছে ?

—"কেয়া জানে বাবু, হামকা মালুম নেই।"

জিজ্ঞেস করলুম—"কোথায় ?"

—"আপিস মে।"

মনে মনে বেজায় ভয় হ'ল। কালকের ব্যাপারটা ত কেউ ফাঁস করে দেয়নি ?—তাই বা দেবে কে ? কই, কেউ ত' ঘুণাক্ষরেও তা' জানতে পারেনি। এক সেই হিন্দুস্থানী চাকরটা,—তা' সেই বা কি করে জানবে ময়দা দিয়ে কি করেছি। তবে ত আজকে হল-ঘরে ময়দা পেয়ে কেউ খোঁজ করেনি ? যদি তাই হয়ে থাকে তবে হয়ত ময়দার খোঁজ করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত আমার নাম উঠেছে।—এখন উপায় ? হেডমাষ্টার মশাই যা বদরাগী মানুষ; আজ আর তা'হলে রক্ষে নেই—বেতের সাথে পিঠের আস্ত চাম উঠিয়ে তবে ছাড়বেন !

ভয়ে ভয়ে অফিস ঘরে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়াতেই হেডমাষ্টার মশাই দু'চোখ জবাফুলের মত লাল করে বলে উঠলেন—"হুঁ, লেখাপড়া নেই, কেবল দুষ্টোমি—দিনে দিনে বড্ড ইয়ার হয়ে উঠেছ সতু, না ? আচ্ছা দাঁড়াও।" তারপর সিংহের মত গর্জ্জন করে বল্লেন—"দপ্তরী, বেত।"

সর্ব্বনাশ ! এখন উপায় ?

মাথাটা আমার কেমন যেন চড়কি-পাকের মত ঘুরতে লাগ্‌ল। দেওয়াল ধরে টাল সাম্‌লে চেয়ে দেখি, চার দিকে সব মাষ্টার মশাইরা আমার দুর্দ্দশা দেখবার জন্যে উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন। সবার মধ্যেখানে সুপারিণ্টেণ্ডেটবাবু। চোখ দু'টো দিয়ে যেন তাঁর আগুন বেরুচ্ছে ! আর তাঁরই পাশে কে একজন বসে রয়েছেন, মাথাটা তাঁর সাদা ন্যাক্‌ড়ায় 'ব্যাণ্ডেজ' করা।—ইনিই কি তবে ড্রিল মাষ্টার মশাই ?

হ্যাঁ তাইত,—কিন্তু এঁর এ দুরবস্থা কেন ? পর মুহূর্ত্তেই আমার মনে প'ড়ে গেল গত রাতের সেই ছিঁড়ে পড়া ড্রপ সিনটার কথা।

ইস্কুলের সমস্ত ছেলেরা বাইরে থেকে দরজা জানালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে রয়েছে—আমার দণ্ডের পরিমাণ দেখবার জন্যে।

সমস্ত ইস্কুল-সুদ্ধ লোকের সামনে আজ আমি এমনি ভাবে মার খাব ? ছিঃ ছিঃ ! এত অপমান আজ আমাকে মাথা পেতে সহ্য করতে হবে ?—লজ্জায়, ঘৃণায়, রাগে আমার কান্না পেতে লাগ্‌ল। বার বার কেবলই মনে হ'ল কেন অমন দুর্ব্বুদ্ধি মাথায় খেলেছিল।

দপ্তরী বেত নিয়ে এল—শপাং শপাং শব্দে টেবিলের ওপর বার কয়েক ঠুকে হেড্‌মাষ্টার মশাই চেয়ার ছেড়ে টেবিলে ভর করে উঠে দাঁড়ালেন।

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে হাত জোড় করে বল্‌লুম—"মাপ করুন স্যার—আর করব না।"

হুঙ্কার ছেড়ে হেড্‌মষ্টার মশাই বল-লেন—"নেভার—কাম্ ফরোয়ার্ড আই সে—এগিয়ে এস বলছি!"

দেখলুম, হেড্‌মাষ্টার মশাই যেরূপ রেগে গেছেন তা'তে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেও নিস্তার নেই।

হঠাৎ মনে একটু বলের সঞ্চার হ'ল। মার যখন খেতেই হবে তখন অমনি খাবো না। বোঁ করে মাথা দিয়ে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। যা' থাকে কপালে—এগিয়ে

এসে একদমে বলে ফেললুম—"মারুন স্যার তা'তে দুঃখ নেই, কিন্তু তার আগে আপনিই বিচার করুন, এতগুলো ছেলেকে 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট'-বাবু অযথা যে ভূতেব ভয় দেখিয়ে চিরদিনের তরে ভীরু করে তুল্‌ছেন—সেটা ভেঙে দিয়ে আমি অন্যায় করেছি কিনা।"

হঠাৎ হেড্‌মাষ্টার মশায়ের গোঁফের ফাঁকে সাদা এক পাটি দাঁত বেরিয়ে এল। মনে হ'ল তিনি যেন একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। তারপরই আবার গম্ভীর হয়ে বেতটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন—"যাও—এর পর আর কোন দিন যেন তোমার নামে কোন নালিশ না আসে।

নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। দরজার আড়ালে গিয়ে আড় চোখে তাকিয়ে দেখলুম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর মুখখানা যেন রাগে আরও লাল হ'য়ে উঠেছে।

যাক্, সেই থেকে বোর্ডিংএর ছেলেদের ভূতের ভয় চলে গেছে—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর মুখে আর সাঁওতাল সর্দ্দারের প্রেত-আত্মার কথা শোনা যায়নি।
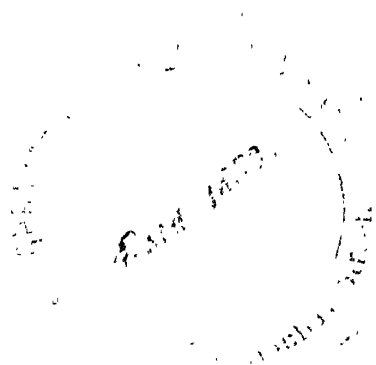
টিকেট চেকার
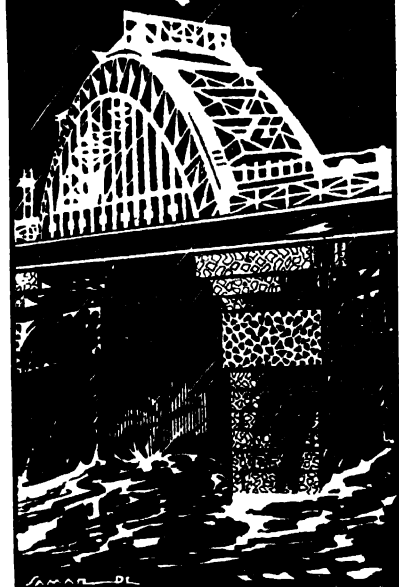
মেজদাবলেছিল এবার যদি বার্ষিক পরীক্ষায় সব বিষয়ে খুব ভাল নম্বর পেয়ে পাশ কর্‌তে পারি, তা'হলে বড়দিনের ছুটীতে এসে আমায় কোল্‌কাতা নিয়ে যাবে, বেড়াতে। পরীক্ষার দু'মাস আগে থেকে রাতদিন বই নিয়ে কাটিয়ে দিলুম।

পরীক্ষা হয়ে গেল, লিখ্‌লুমও বেশ।

সেইদিনের ডাকেই মেজদাকে চিঠি লিখে বস্‌লুম—

আঁধার রাতের

মুসাফির

"মেজদা,

পরীক্ষা আমাদের হয়ে গেছে। খুব ভাল লিখেছি। ভাল মার্ক তো পাবই—হয়ত ফার্ষ্ট-ও হয়ে যেতে পারি। তাও যদি বা না হই, অন্তত সেকেণ্ড তো নিশ্চয়ই! তুমি কবে আস্‌ছ মেজদা লিখো—দেখো, শেষে আবার ফাঁকি দিওনা কিন্তু! তা'হলে আস্‌ছে বছর আমি ইচ্ছে করে ফেল হ'ব।"

পরের ডাকে মেজদার চিঠি এল—

"স্নেহের ভাইটি আমার, তোমার চিঠি পেলুম। তুমি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হবে জেনে খুব সুখী হয়েছি। আমাদের কলেজ ছুটী হলেই আমি চলে আস্‌ব। তুমি তোমার জামা কাপড় সব গুছিয়ে রেখো। আমি যে-দিনের গাড়ীতে বাড়ী পৌঁছব, সেই দিনই রাত্রের গাড়ীতে আবার তোমায় নিয়ে কোল্‌কাতা চলে আস্‌ব। তোমাদের পরীক্ষার 'রেজাল্ট' বের হ'লেই আমায় জানিয়ো। ইতি

তোমার মেজদা।"

চিঠি প'ড়ে গর্ব্বে আমার বুকটা ফুলে উঠ্‌ল। ছুটে বে'র হয়ে পড়লুম পাড়ার ছেলেদের কাছে।

মণ্টা সেদিন বেজায় চাল দিচ্ছিল, ও কোল্‌কাতা গেছে,—কথাকওয়া বায়স্কোপ দেখেছে, রয়াল সার্কাস দেখেছে,

টিকেট চেকার

আলিপুরের বাগানে অদ্ভুত অদ্ভুত সব জানোয়ার দেখেছে, যাদুঘরে তিরিশ হাত লম্বা তিমি মাছের চোয়াল দেখেছে। আচ্ছা, দাঁড়াও! এবার দেখ্‌বে আমি কোল্‌কাতায় গিয়ে কি দেখে আসি।

মনে মনে ঠিক করলুম, খুঁজে খুঁজে এমন সব অদ্ভুত জিনিষ আমি দেখে আস্‌ব, যে তার নাম করলে, মণ্টা তো মণ্টা, তার চাইতে বড়টাও একেবারে হাঁ হয়ে যাবে। আমি দেখ্‌ব পাঁচহাজার বছরের 'ইজিপ্‌শিয়ান্‌ মমি'। —যার নাম ওরা কোন কালে শোনেনি।

বড়দিনের ছুটী এল, কিন্তু মেজদা আর এল না। আস্‌বার আর তার দরকারও হ'ল না। কারণ ফার্ষ্ট ষ্ট্যাণ্ড করা আর আমার হ'ল না, সেকেণ্ড প্লেস্‌ও ভাগ্যে জুটল না। কপালদোষে থার্ড প্লেস্‌ও না। তারপর প্রমোশনের দিন পাশ-করা ছেলেদের লিষ্টের ভেতর আর আমার নাম খুঁজে পেলুম না। মার্ক-শিটে দেখ্‌লুম, অঙ্কের ঘরে মস্ত একটা গোল আলু। সর্ব্বনাশ!

কোলকাতা যাওয়া দূরের কথা, এখন কোন্‌ মুখে গিয়ে বাড়ী উঠ্‌ব সেই ভাবনাটাই আমায় অস্থির করে তুল্‌ল। এত বড় দুঃখও আমার কপালে ছিল!

দু'চোখ দিয়ে আমার আপ্‌না আপ্‌নিই জল এল। ফেল করে লোকে কাঁদে, আমিও কাঁদলুম। কিন্তু সে কাঁদা ফেল করার দুঃখে নয়—কোল্‌কাতা যেতে পারলুম না তাই বোধ করি।

মেজদাকে আর চিঠি লিখে জানাবার মত আমার কিই বা আছে। চোরের মত চুপ করে দিন কাটাই, ভাবি মেজদার কানে এ সুখবরটা না গেলেই বাঁচি।

কুকথা বাতাসের আগে ধায়।

সেদিনের ডাকে মেজদার এক চিঠি এল। এবার 'স্নেহের ভাইটি'র জায়গায় 'হতভাগা' দিয়ে চিঠি আরম্ভ। ভয়ে ভয়ে চিঠিটা পড়তে লাগ্‌লুম—

"হতভাগা! এই বুঝি তোমার ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ষ্ট্যাণ্ড করা—না? অঙ্কে তুমি শূন্য পেলে কি করে? র'সো, এবার বাড়ী গেলে তোমায় কোল্‌কাতা দেখিয়ে তবে ছাড়্‌বো।"

অক্ষর গুলো যেন চোখ রাঙিয়ে আমায় শাসন কর্‌লে।

কপালের লিখন নাকি কেউ খণ্ডাতে পারে না। কোল্‌কাতায় যাওয়া আমার হ'ল—তা সে ফেল করেও। আর সেই মেজদাকেই এসে আমায় নিয়ে যেতে হ'ল, —তবে বেড়াতে নয়।

টিকেট চেকার

সেদিন হঠাৎ রাস্তার একটা লেড়ে কুকুর আমায় কাম্‌ড়ে দিলে, তাইত! নইলে···

যাক্, ভেবেছিলুম মেজদা হয়ত এসেই কসে দু'গালে দু' চাঁটি মেরে বল্‌বে—'হতভাগা ছেলে, পাশ করে কোলকাতা যেতে পার্‌লে না; তুমি ফন্দি এঁটে তাই রাস্তার কুকুরের মুখে হাত দিতে গিয়েছিলে, কেমন?' কিন্তু হ'ল তার উল্টো। মেজদা এসে আদর করে গাল টিপে বল্‌লে—"লক্ষ্মী আমার, আর যেয়ো না কিন্তু রাস্তার কুকুরের গায়ে ঢিল ছুড়্‌তে! জানো না ত', কুকুরের দাঁতে কি ভয়ঙ্কর বিষ!"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চৌদ্দটা দিন আমার কোল্‌কাতায় কেটে গেল। কোল্‌কাতার যে ছবি এত দিন মনে মনে এঁকে রেখেছিলুম এবার প্রত্যক্ষ দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলুম! এখানকার রাস্তা-ঘর, দালান-কোঠা, গাড়ী-ঘোড়া, মোটর-ট্রাম সবই যেন একটা নূতন প্রাণ, নূতন উৎসাহ এনে দেয়। শুধু কাজ-কাজ-কাজ! সবাই যেন কত ব্যস্ত! এখানে যারা কুঁড়ের মত বসে থাক্‌বে তারাই পড়্‌বে মারা। মনে হ'ল এই কোল্‌কাতাতেই থেকে যাই। কিন্তু মার কথা মনে পড়ায় আমি বাড়ী যাবার জন্যে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠ্‌লুম।

মেজদা বল্‌লে—"তোকে নিয়ে আমার হ'ল এক মুস্কিল! বল্ ত' কলেজ কামাই করে তোকে আবার কি করে আমি বাড়ী রেখে আসি?"

আমি বল্‌লুম—"মেজদা, আমায় কি এতই ছেলেমানুষ পেয়েছ, যে সাথে করে আবার বাড়ী রেখে আসতে হবে?"

মেজদা বল্‌লে—"পার্‌বি একা বাড়ী যেতে?"

আমি বল্‌লুম—"পারব না আবার!"

"ভয় পাবে না তো?"—"ভয়! কিসের ভয় মেজদা? তুমি কি খেপেছ?"

মেজদা বল্‌লে—"না থাক্, কাজ নেই। শেষে আবার এক কাণ্ড করে বস্‌বি। দেখি কোন সাথী পাওয়া যায় কিনা। না হয় দুদিন বাদেই যাবি। কি এমন হবে তা'তে।"

জোর গলায় বল্‌লুম—"না মেজদা, আমি পার্‌ব একা যেতে, তুমি আমায় গাড়ীতে তুলে দিয়েই দেখ না!"

রাত ন'টার সময় হাওড়া থেকে একটা গাড়ী ছাড়ে। সেই গাড়ীতে চেপে বস্‌লে আর ভাব্‌না নেই,—পরদিন খুব ভোরে একেবারে আমাদের বাড়ীর

ইষ্টিশানে। বদ্‌লি নেই কিছু নেই—শুধু একটা রাত। এরই জন্যে আবার এত ভাব্‌না।

ইণ্টার ক্লাসের একখানা 'হাফ্' টিকেট কিনে মেজদা আমায় নিয়ে ছোট্ট একটা কামরায় উঠ্‌ল। শীতের রাত; ওভারকোটটা আমার গায়ে পরিয়ে দিয়ে মেজদা বেঞ্চের ওপর কম্বল পেড়ে বিছানা করে দিলে। বার বার সাবধান করে দিলে, গাড়ী থেকে যেন না নামি; আর পৌঁছেই যেন চিঠি দিই।

গাড়ী ছেড়ে দিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের দিকে চেয়ে রইলুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেজদা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

এক মুহূর্ত্তে নিজেকে যেন আমার কেমন অসহায় মনে হতে লাগ্‌ল। প্রাণটা কেন যেন হুর্‌হুর্ করে কেঁপে উঠ্‌ল! মনে হল চল্‌তি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ি—একা যেতে আমার বড্ড ভয় কর্‌বে।

গাড়ীর ভেতর থেকে বুড়ো এক ভদ্রলোক বল্‌লেন—"খোকা, জানালা ছেড়ে এসো, শুয়ে পড়; ভয় কি, আমরা অনেক দূর অব্‌ধি তোমার সাথে আছি।"

অনেকখানি বল পেলুম, বল্‌লুম—"না ভয় আর কি।"

আঁধার রাতের

মুসাফির

সারারাত ধরে গাড়ী ছুটে চলেছে। ইষ্টিশানে লোক উঠ্‌ছে নেমে যাচ্ছে, কে তার হিসেব রাখে। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলুম। কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন কোল্‌কাতার গাড়ীগুলো কেবলই আমার মগজের ভেতর নাগরদোলার চড়্‌কিপাকের মত ঘুর্‌পাক খাচ্ছে।

বার বার মুখ তুলে দেখ্‌লুম অন্যান্য যাত্রীরা সব দিব্যি আরাম করে ঘুমুচ্ছে!

এ ভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন আমায় ডাক্‌ছে—"এই এই ওঠো! টিকেট দেখ্‌লাও!"

ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বস্‌লুম। কিন্তু কই! এদিক সেদিক চেয়ে কাউকে দেখ্‌তে পেলুম না। বাইরের পানে চেয়ে দেখ্‌লুম ঝড়ের মত গাড়ী ছুটে চলেছে। গোটা কামরায় একটা লোকও নেই। এ গাড়ীতে যারা ছিল তারা তবে আগের ইষ্টিশানে নেমে গেছে। শুধু আমি একা এত বড় একটা কামরাতে! ভাব্‌তেই বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল।—কিন্তু কে একজন আমায় ডাকলে না?—কই কাউকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না!

কেমন যেন ভয় ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। কম্বলটা গায়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম। একটু পরেই মনে হ'ল, কে যেন আমার গা ঘেঁসে বেঞ্চে বসে পড়ল। মাঝে কোন ইষ্টিশান নেই, অথচ গাড়ীতে লোক এলো কোত্থেকে ?

—আবার সেই স্বর—"এই টিকেট দেখ্‌লাও !"

মুখের ওপর থেকে কম্বলটা ফেলে দিতেই মনে হ'ল আমার কাছে ছায়ার মত কালো কি একটা দাঁড়িয়ে। উঠে দেখি, কালো সার্জ্জের সাহেবী পোষাক পরা একজন লোক, মাথায় একটা সাদা টুপী। এই লোকটাই তবে এতক্ষণ ধরে ডাক্‌ছে—হ্যাঁ, তাইত! এযে টিকেট চেকারই বটে !

ওভারকোটের পকেট থেকে টিকেটটা বের ক'রে তা'র হাতে দিতে গেলুম। মুখের দিকে চাইতেই মনে হ'ল লোকটা যেন আমার চেনা। ভাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম। কি আশ্চর্য্য! এ আমাদের গাঁয়ের বিশুদা না !

এক নিমিষে ভয়টা আমার কেটে গেল। আনন্দে চীৎকার করে ডাকলুম—"বিশুদা, ও বিশুদা, চিন্‌তে পারছো আমায় ?"

লোকটা কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বল্‌লে —"কে রে তুই, পট্‌লা না? বেশ বড়সড় হয়েছিস্ দেখ্‌ছি—চিন্‌তে পার্‌লি আমায়?"

হেসে আমি বল্‌লুম—"বাঃ রে! তা আর পারব না? এক বছরে লোকে লোককে ভুলে যায় নাকি? হ্যাঁ, তবে প্রথমটা চিন্‌তে পারিনি—তোমার ঐ কালো কোট প্যাণ্ট আর সাদা টুপী কেমন যেন খট্‌কা বাধিয়ে দিয়েছিল।"

নিজের গায়ের পোষাকের দিকে একবার চেয়ে বিশুদা বল্‌লে—"এ গুলো পরলে আমায় ভারি বিশ্রী দেখায়— না রে পট্‌লা?"

ঘাড় নেড়ে আমি বল্‌লুম—"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তো আজ এক বছর হ'ল বাড়ী থেকে রাগ করে চলে গেছ্‌লে! এতদিন তবে রেলের চাকরী কর্‌ছ বুঝি?"

কথাটা বলার সাথে সাথেই বিশুদা যেন কেমন নিরুৎসাহ হয়ে গেল। বাইরের দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে—"হ্যাঁ, কিন্তু এখন আর করি না।"

—"কর না কি রকম? ঐ ত তোমার গায়ে রেলের উনিফর্ম্ম রয়েছে!"

তেম্‌নি ভাবে বিশুদা বল্‌লে—"ওটা যখন চাকুরী কর্‌তুম তখনকার।"

"কিন্তু আমার কাছে যে টিকেট চাইছিলে ?"

—"চাইছিলুম নাকি ?"

—"বা রে! চাইছিলে না আবার! তুমি নিশ্চয় রেলের কাজ কর—দাঁড়াও, বাড়ী গিয়ে আমি তোমায় ধরিয়ে দেব। দেখ্‌ব তুমি কি করে পালিয়ে ফেরো।"

বিশুদা একটু হেসে বল্‌লে—"বেশ ত' দে না—আমি তো বাড়ীই যাচ্ছি।"

আহ্লাদে আটখানা হয়ে বল্‌লুম, "ঠিক বাড়ী যাচ্ছ বিশুদা ?"—"হ্যাঁ রে হ্যাঁ।"

আমি একটু হেসে বল্‌লুম, "আচ্ছা বিশুদা, একটা কথা বল্‌ব রাগ কর্‌বে না ?"

বিশুদা একটু হেসে বল্‌লে—"দুর পাগ্‌লা, বল্ না।"

"আচ্ছা তুমি বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছ্‌লে কেন ?"

সহজভাবে বিশুদা বল্‌লে—"ম্যাট্রিকুলেশান্ পরীক্ষায় ফেল করে।"

—"ও ভাই! আচ্ছা এত দিন তবে কি করে কাটালে বল না বিশুদা!"

আঁধার রাতের

মুসাফির

বিশুদার মুখে কথা নেই।

—"ও বিশুদা, চুপ করে রইলে কেন, বল না ?"

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বিশুদা দু'হাত প্যাণ্টের পকেটে পুরে দিয়ে বল্‌লে—"শুন্‌বি সে কথা ? আচ্ছা শোন তবে বল্‌ছি—

তোর মেজদার সাথে যে বার ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিলুম, সেবার তোর মেজদা কর্‌লে পাশ, আর আমি করলুম ফেল! সে বার নিয়ে আমার পর পর চার বার ম্যাট্রিক ফেল করা হ'ল। তারপর বুঝ্‌তেই পারছিস্ বাবার সে কি গাল মন্দ! ফেল কি দুনিয়ায় কেউ করে না, তাই বলে—যাক্, সেই যে বাড়ী থেকে বের হলুম আর ফিরলুম না। মনে মনে ঠিক করলুম, যেমন করেই হোক ম্যাট্রিক পাশ কর্‌তেই হবে। তারপর আর এ দেশে নয় একেবারে সোজা চলে যাবো বিদেশে। ছোট বেলা থেকেই সমুদ্র পাড়ি দিতে আমার বড্ড ইচ্ছে ছিল।

সেইদিনই পালিয়ে কোল্‌কাতা চলে এলুম। ঠিক কর্‌লুম আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কারও সাহায্য নেব না, সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সব কর্‌ব। প্রথমটা খুব বেগ পেতে হয়েছিল। ক'দিন না খেয়েও কেটেছে। ইচ্ছে

করলেই কিছু টাকা জোগাড় কর্‌তে পার্‌তুম। কিন্তু তা করিনি। পরের কাছে আর এ জীবনে হাত পাতব না এই ছিল আমার পণ। আর শুধু পণ নয়, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছি। সেই থেকে এক দিনও কারও কাছে একটা কাণাকড়িও ধার চাইনি। তারপর একদিন খবরের কাগজে দেখ্‌লুম, ই-আই রেল কোম্পানীর কতগুলো টিকেট চেকারের দরকার। সোজা এক দরখাস্ত করে বসলুম। সাতদিন পর আমার ডাক পড়ল। কপালজোরে চাকুরীও জুট্‌ল। শুধু রাত্রে 'ডিউটি'; আর দিনে ছুটি।

ভালই হ'ল। দিনের বেলা বসে না থেকে ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেলুম। যা মাইনে পেতুম তা'তে সব চলে যেত বেশ। তারপর রোজ রাত্রে ডিউটিতে যেতুম আর দিনের বেলা ইস্কুলে পড়তুম। মনে মনে কত আশা ছিল, ম্যাট্রিক্‌টা পাশ কর্‌লেই আর এ দেশে নয়, একেবারে বিদেশে! কিন্তু এর ভেতর এক দিন ঘটে গেল এক কাণ্ড!"—ব'লে বিশুদা চুপ কর্‌ল।

আমি উৎসুক হয়ে বল্‌লুম—"কি কাণ্ড বিশুদা? থাম্‌লে যে, বলনা শুনি!" একটু চুপ করে থেকে বিশুদা আবার বল্‌তে সুরু করে দিল।—

আঁধার রাতের

মুসাফির

"হ্যাঁ, রোজ রাত্রে আমাকে ডিউটিতে থাক্‌তে হ'ত। রোজকার মতন সেদিন রাত্রেও ডিউটিতে গিয়েছি। সেদিনের গাড়ীতে প্যাসেঞ্জারের ছিল খুব ভীড়। একটা কাম্‌রায় সব টিকেট চেক্‌ করে অপর কামরায় যাব, দেখি বাইরে খুব জল পড়্‌ছে। তবুও দরজাটা খুলে হাতল ধরে পাদানিতে দাঁড়ালুম। সময় আমার খুব কম। পরের ইষ্টিশানে গাড়ী পৌঁছবার আগেই আমাকে সব টিকেট চেক্‌ করে ফেল্‌তে হবে, তাই এত তাড়া। আমিও পাদানিতে দাঁড়িয়েছি— ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গাড়ীটা সাঁই সাঁই করে গিয়ে একটা

পোলের ওপর উঠে পড়ল। যেই না ওঠা, হঠাৎ কি করে আমার পা-টা গেল ফস্‌কে; মনে হ'ল পেছন থেকে

কে যেন আমায় ধাক্কা দিলে। কিন্তু ধাক্কাই বা আমায় দেবে কে—এ পৃথিবীতে তো আমার কেউ শত্রু নেই! যাক্ তবুও চেষ্টা করে উঠ্‌তে পারতুম; কিন্তু পোলের মস্তবড় একটা থামের সাথে ধাক্কা খেয়ে হাতলটা গেল আমার মুঠোর ভেতব থেকে খসে। প্রবল একটা ঝাঁকুনী খেয়ে আমি ছিট্‌কে পড়লুম গিয়ে একেবারে সেই চলন্ত গাড়ীর চাকার তলায়।”

আমি আঁৎকে উঠে বল্‌লুম—“তার পর? তার পর কি কর্‌লে বিশুদা?”

নিরুৎসাহ হয়ে বিশুদা বল্‌লে—“তার পর আর কি কর্‌ব। মনে হ’ল আমার পাঁজরের হাড়গুলো পাটকাঠির মত মট্‌মট্ করে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল! কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতন লাইনের ফাঁক দিয়ে আমি একেবারে নীচে নদীতে পড়ে তলিয়ে গেলুম। কেউ দেখ্‌তে পেলে না। আর দেখলেই বা কি কর্‌ত তারা আমার। কি অসহ্য যন্ত্রণা পেলুম পট্‌লা, তা’ আর কি বল্‌বো!” ব’লেই —‘উঃ’ ক’রে বিশুদা একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌ল।

শিউরে উঠে আমি বল্‌লুম—“এ সব কি বলছ

বিশুদা! তুমি কি খেপেছ? গাড়ীর চাকার তলায় পড়লে সে লোক আবার বাঁচে কখনও!"

একটা শ্লেষের হাসি হেসে বিশুদা বল্‌লে—"ঐখানেই তো তুই আমায় ভুল বুঝ্‌ছিস্‌। আমি কি আর বেঁচে আছি রে! কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না পট্‌লা, নয়? কিন্তু দেখ্‌ হাড়গুলো আমার আজও জোড়া লাগ্‌ল না।"

ব'লে প্যাণ্টের পকেট থেকে হাত দু'টো বের করে বিশুদা তার কোটের বোতামগুলো খুলে দিলে।

টিকেট্‌ চেকার
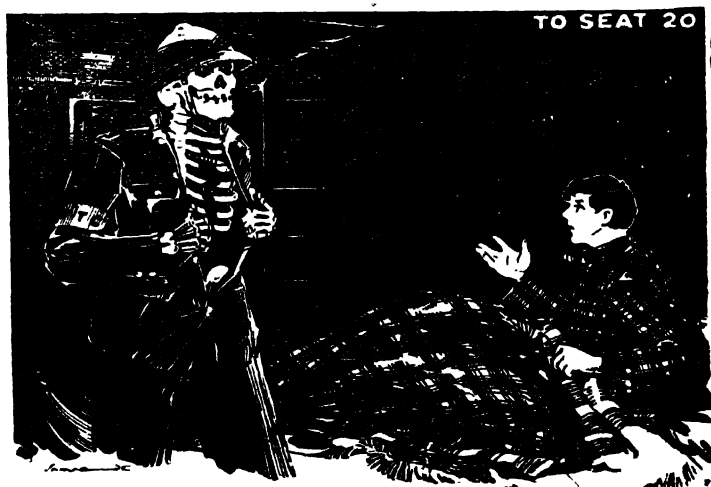
বুকটা আমার ছ্যাৎ করে উঠ্‌ল! একি! বিশুদার বুকের মাংস কই! এযে শুধু সাদা ধব্‌ধবে হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে!

ভয়ে কাঁপতে কাঁপ্‌তে আমি ওপরের দিকে চেয়ে ডাক্‌লুম, "বিশুদা! বিশুদা!" কিন্তু কোথায় বিশুদা! এযে 'হ্যাট্‌' মাথায় একটা কঙ্কাল! সব্বনাশ!

ডাক ছেড়ে চীৎকার করে আমি ছুটে পালাতে গেলুম; কিন্তু ছুটে আমি এ চলন্ত গাড়ী থেকে যাবো কোথায়! চীৎকার করলেই বা শোনে কে! তবুও প্রাণপণে একটা চীৎকার করে উঠ্‌লুম, তারপর আর কিছুই মনে নেই।